ভারতীয় বস্তুবাদ ও পরমাণুবাদ-৩

বিরঞ্জন রায়

পরমাণুবাদের সমর্থনে যুক্তিসমূহ

পরমাণুবাদের আদি প্রবক্তারা পরমাণুর সমর্থনে কোন ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বা শাস্ত্রবচনের দোহাই দেন নি। কিন্তু তাদের 'ধার্মিক' উত্তরসূরীরা গুজামিল দিয়ে শাস্ত্রবচনের সমর্থন খুঁজেছেন। এটি তাদের ব্যক্তিগত ঝোঁক না তৎকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক আবহের ফল তা বলা শক্ত। তা যাই হোক আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পরমাণুবাদীরা নির্ভর করেছেন মূলত যুক্তির উপরই। পরমাণুর সমর্থনে তারা দু' ধরনের যুক্তি তুলে ধরেছেন।

যৌক্তিক সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণ: পৃথিবীতে ছোট বড় নানান বস্তু দেখতে পাই। যদি তুলনা করি তবে বলতে পারি বালিকণা থেকে পাথরের টুকরা বড়। পাথরের টুকরা থেকে পাহাড় বড়। পাহাড় থেকে পৃথিবী বড়। এভাবে আমরা ক্রমে এমন এক বৃহৎ এর ধারণায় পৌঁছি, যা সর্বব্যাপী, যেমন আকাশ ও কাল। এর চেয়ে বড় কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি না। কাজেই সবচেয়ে বড় কিছু একটাকে মেনে নিতে হয়।

বিপরীত যুক্তিতে পৃথিবী থেকে পাহাড় ছোট। পাহাড় থেকে পাথর ছোট। পাথর থেকে বালিকণা ছোট। বালিকণাকে ভাঙতে থাকলে আমরা আরও ক্ষুদ্র কণিকা পেতে পারি। এভাবে ভাঙতে ভাঙতে আমরা এমন একটা ক্ষুদ্র কণিকার কথা কল্পনা করতে পারি, যার চেয়ে ক্ষুদ্র কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই সম্ভাব্য সবচেয়ে ক্ষুদ্র কণিকাই পরমাণু।

পরমাণু বিরোধী যুক্তির যৌক্তিক অসম্ভাব্যতার প্রতিপাদন

যদি পরমাণুকে সবচেয়ে ক্ষুদ্র কণিকা মানা না হয়, তবে পরমাণুকে অসংখ্য ভাগে ভাগ করা সম্ভব হবে। সে যুক্তিতে একটি পাহাড়কেও অসংখ্য ভাগে ভাগ করা সম্ভব এবং একটি সরিষা দানাকেও অসংখ্য ভাগে ভাগ করা সম্ভব। এ বিবেচনায় পাহাড় এবং সরিষা দানার মধ্যে অংশ-পরিমাণ-ওজন এসব কোন বিবেচনাতেই কোন পার্থক্য থাকবে না। একটি সরিষা দানার টুকরো দিয়ে সারা পৃথিবী ঢেকে দেওয়া সম্ভব হবে।

যদি পরমাণুকে স্থায়ী কণিকা না মানা হয়, তবে প্রলয়কালে পরমাণুও লোপ পাবে, কোন বস্তুই থাকবে না। তারপর প্রলয়ের এ শূন্যতা থেকে নতুন সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব হবে ? শূন্যতা থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না।

পরমাণুবাদের উৎস

কোন কোন গবেষক মনে করেন ভারতীয় পরমাণুবাদ গ্রীক পরমাণুবাদেরই অনুসারী। কেউ কেউ ভারতীয় পরমাণুবাদের ভারতীয় উৎসের পক্ষে যুক্তি দেখান। আমরা সে ধারাই অনুসরণ করব।

আমরা প্রাক্-পরমাণুবাদী ধারণার প্রথম সাক্ষাৎ পাই ছান্দোগ্য উপনিষদে (আনুঃ ৭০০ খি.পূ)। এ উপনিষদের ঋষি উদ্দালক আরুণি বিশ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় তার পুত্র শ্বেতকেতুর প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছেন, তাকে প্রাক্ পরমাণুবাদী ধারণা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ছান্দোগ্যে উদ্দালক বিভিন্ন বর্ণনা ও উদাহরণ দ্বারা 'তৎত্বমসি' (তুমি-ই সেই) বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে এ বিশ্ব অস্তিত্ববান অর্থাৎ 'সৎ'। কোন অনস্তিত্ব বা শূন্যতা (অসৎ) থেকে এ অস্তিত্বের (সৎ) সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি সেই আদি অস্তিত্বকে চিহ্নিত করেছেন সৎ বলে। সে সৎ সংকল্প করলেন, তিনি বহু হবেন। প্রথমে সৎ থেকে 'তেজ' এর সৃষ্টি হল। তারপর তেজ থেকে 'জল' এবং জল থেকে 'অন্ন' (খাদ্য বস্তু) সৃষ্টি হল। তেজ জল অন্ন এ তিন 'আদি দেবতা' থেকেই ক্রমে অন্যান্য বস্তুসমূহের সৃষ্টি। কাজেই বস্তুর মূলে রয়েছে, আদি সৎ। তোমার মধ্যেও সেই সৎ রয়েছেন। কাজেই তুমি-ই সেই সৎ (তৎত্বমসি)।

লক্ষ্যযোগ্য এখানে বস্তু এবং চেতনা বা ভাব, এ পরস্পর বিপরীতাত্মক ধারণাটি অনুপস্থিত। বরং সেই 'সৎ' বস্তুও বটে, চেতনাও বটে। উদ্দালকের মতে, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়। খাদ্যের সূক্ষ্ম সার থেকে মনের, জলের সূক্ষ্ম সার থেকে প্রাণের, তেজষ্কর খাদ্যের (যেমন ঘি) সূক্ষ্ম সার থেকে বাক্ এর উৎপত্তি। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কিছুদিন জল ভিন্ন কিছু খেতে দিলেন না। শ্বেতকেতু বেঁচে রইলেন কিন্তু তার কণ্ঠ ক্ষীণ হল এবং পঠিত বিষয় ভুলে গেলেন। পুনরায় তাকে খাবার দেয়া হল। কয়েকদিনের মধ্যেই তার কথা ফুটল এবং তিনি শেখা বিষয় আবৃত্তি করতে পারলেন। অর্থাৎ জল তার প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু খাদ্য ও তেজষ্কর খাদ্যের অভাবে তার মন ও বাক্ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এভাবে উদ্দালক পরীক্ষার মাধ্যমে ছেলেকে তার তত্ত্বের সত্যতা প্রদর্শন করলেন।

সূক্ষ্ম বস্তু থেকে স্থূলবস্তুর কিভাবে উৎপত্তি হতে পারে তা প্রদর্শনের জন্য উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বললেন, এই বটগাছ থেকে একটি ফল নিয়ে আস। পুত্র ফল নিয়ে এলে পিতা বললেন এটি ভাঙ্গো। পুত্র- ভেঙ্গেছি। পিতা- কি দেখতে পাচ্ছ ? পুত্র- অণুর মতো সব বীজ। পিতা- এদের একটিকে ভাঙ্গো। পুত্র- ভেঙ্গেছি। পিতা- এখন কি দেখছ ? পুত্র- কিছুই না। তখন উদ্দালক পুত্রকে বললেন, সে সৌম্য, বীজের মধ্যে যে সূক্ষ্মতম অংশ আছে, তা তুমি দেখছ না। এই সূক্ষ্মতম অংশেই বিরাট বটবৃক্ষ রয়েছে।

অর্থাৎ একটি সূক্ষ্ম 'সৎ' থেকেই এই স্থূল বৈচিত্রময় জগতের উৎপত্তি। এই পরিবর্তমান স্থূল জগতের অন্তরালে রয়ে গেছে একটি অপরিবর্তনেয় সূক্ষ্ম 'সৎ'। উদ্দালকের এ ধারণা থেকে পরমাণুর ধারণার বিকাশ ঘটা সম্ভব। উদ্দালক প্রদর্শনমূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তার ধারণাটিকে বর্ণনা করেছেন। এজন্য তাকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের আদিম প্রতিনিধি বলে গণ্য করা যায়।

বৈদিক ধারার বাইরেও প্রাক্-পরমাণুবাদী ধারণার সাক্ষাত পাওয়া যায়। যেমন, বৌদ্ধের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক তির্থিক (দার্শনিক) পকুদ কাচ্চায়ন (আনুঃ ৫২৩ খি.পূ) 'শাশ্বতবাদ' প্রচার করতেন। তার মতে বস্তু সমূহ চার মহাভূত (মৃত্তিকা জল তেজ বায়ু) নির্মিত। এ চারভূত নিত্য। অর্থাৎ এরা সব সময়ই বর্তমান, এদের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই। অবশ্য কিভাবে চারভূত মিলিত হয়, এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। চার ভূতের সঙ্গে তিনি সুখ-দুঃখকেও পৃথক উপাদান বলে মেনেছেন। তিনি বলতেন এই উপাদানগুলির মধ্যে যথেষ্ট শূন্য স্থান আছে, যেখানে আমাদের কঠিনতর আঘাতও ঠেকে যায়, মূল উপাদানকে স্পর্শ করতে পারে না। এ মতবাদই বলে দেয় যে দৃশ্য-উপাদানের মধ্যেও কোন প্রকার সূক্ষ্ম উপাদানও তিনি মানতেন, যাকে একপ্রকার পরমাণুবাদ বলা চলে। শূন্যস্থান বা আকাশকে তিনি পৃথক পদার্থ বলে মানেন নি।

পরমাণুবাদের স্থানীয় উৎসের সমর্থকরা, গ্রীক পরমাণুবাদের উদ্ভবের সমকালীন গ্রীসের দার্শনিক পরিস্থিতির সঙ্গে, ভারতীয় পরমাণুবাদের উদ্ভবের সমকালীন ভারতীয় দার্শনিক পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পান। দার্শনিক পারমেনিদেস প্রচার করতেন জগতে আপাত পরিবর্তনের অন্তরালবর্তী মূল সত্তা অপরিবর্তনশীল, স্থির। পক্ষান্তরে হেরাক্লিতস প্রচার করতেন মহাবিশ্বের কিছুই স্থির নয়। আপাত যাকে স্থির মনে হয়, ভালোভাবে বিবেচনা করলে তাও স্থির নয়। এ দুটি বিপরীতমুখী ধারণাকে সংশ্লেষিত করে দেমোক্রিতস বললেন পরমাণু সমূহ অপরিবর্তনশীল। কিন্তু তাদের মধ্যে সংযোগ বিয়োগ ঘটে। এটিই জগতের দৃশ্যমান পরিবর্তনশীলতার কারণ।

ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রচার করতেন, পরিবর্তমান জগতের মূলগত সত্তা'ব্রহ্মণ' নিত্য ও স্থির। অন্যদিকে বৌদ্ধেরা প্রচার করতেন, জগতের

সবকিছুই অনিত্য। এ দুটি বিপরীতমুখী ভাবধারার সংশ্লেষে ভারতীয় পরমাণুবাদের উৎপত্তি। পরমাণুবাদী মতে পরমাণু নিত্য ও স্থির। কিন্তু তাদের মধ্যে সংযোগ বিয়োগের ফলেই জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষগোচর হয়।

চতুর্ভূত না পঞ্চভূত ?

আমরা দেখেছি ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি উদ্দালক আরুণি আদি সৎ থেকে প্রথমে তেজ, তেজ থেকে জল এবং জল থেকে অন্ন-এর উৎপত্তির বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা তেজ, জল ও মৃত্তিকা এ তিন ভূতের প্রথম বিবরণ পেলাম। ছান্দোগ্যেরই আরেক ঋষি সযুগ্বা রৈক্ক-র মতে সৃষ্টির মূল উপাদান বায়ু। কারণ তেজ বা অগ্নি বায়ুতে নির্বাপিত হয়। মানুষের ইন্দ্রিয় সমূহ ও মন, প্রাণে নিমগ্ন হয়। বায়ু ও প্রাণ এক। এভাবে আমরা ছান্দোগ্যেই চতুর্ভূতের পরিচয় পেয়ে গেলাম। আকাশ ভুতের আবির্ভাব আরো পরের উপনিষদ 'তৈত্তিরীয়'তে। এখানে কোন ঋষির উল্লেখ না করেই বর্ণনা করা হয়েছে, 'আত্ম-শব্দ-বাচ্য ব্রহ্ম হতে আকাশ উৎপন্ন হয়েছে। আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে অগ্নি, অগ্নি হতে জল, জল হতে পৃথিবী।' দেখা যাচ্ছে আকাশের পরবর্তী পর্যায়গুলোর বিকাশ বর্ণনায় পূর্বে বর্ণিত ছান্দোগ্যের দুই ঋষির ধারণাকে আত্মীকৃত করা হয়েছে। এখানে প্রাথমিক সত্তা হিসাবে আরুণির 'সৎ' এর পরিবর্তে 'আত্ম' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রাচীন উপনিষদ সমূহে 'আত্ম' দেহবিচ্ছিন্ন কোন সত্তায় রূপান্তরিত হয়নি; 'ব্রহ্ম'ও বস্তুসম্পর্কহীন বিশুদ্ধ চৈতন্যে পরিণত হয়নি। তাই তৈত্তিরীয়ের উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে, 'পৃথিবী হতে ওষদিসমূহ, ওষদিসকল হতে অন্ন, অন্ন হতে দেহধারী পুরুষ উৎপন্ন হয়েছে। উক্ত পুরুষ অন্নরসের বিকার স্বরূপ।' উপনিষদে আবির্ভুত এ পঞ্চভূত ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ঐতিহ্যের অংশ।

বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধারার বিরোধীরা আকাশ ভূতকে স্বীকার করেননি। এ ব্যাপারে পকুধ কাচ্চায়নের মত আমরা আলোচনা করেছি। একই রকম কথা শুনা যায় তারই আরেক সমসাময়িক তীর্থঙ্কর (দার্শনিক) অজিত কেশকম্বল (আনুঃ ৫২৩ খি.পূ) এর কণ্ঠে। দেহ চতুর্ভূতে তৈরী। মৃত্যুর পর চারভূত চারভূতে মিলিয়ে যায়। আত্মা বলে পৃথক কিছু নেই। সেজন্য পরকালও নেই। আমরা আগেই দেখেছি, চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ এ তিনটি নাস্তিক দার্শনিক ধারা আকাশকে ভূতের স্বীকৃতি দেয়নি।

গ্রীক পরমাণুবাদের সঙ্গে তুলনা

গ্রীক দর্শন ধর্মতন্ত্র মুক্ত, যদিও কখনও তা ধর্মতন্ত্র প্রভাবিত। বিপরীতে ভারতীয় দর্শন ধর্মতন্ত্র যুক্ত। একমাত্র ব্যতিক্রম লোকায়ত বা চার্বাক। ধর্মতান্ত্রিক প্রভাব জৈন ও বৌদ্ধ পরমাণুবাদকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে দেয় নি। বৈশেষিক দর্শন, যার মূল উদ্দেশ্য ধর্মতন্ত্র নয়, সেখানেও ধর্মতন্ত্র ঢুকে পড়েছে। তাই 'অদৃষ্টের' মাধ্যমায়িত হয়ে আত্মার কর্মফল, পরমাণু সংযোগের আদি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। থালেস থেকে দেমোক্রিতস, গ্রীক প্রাকৃতিক দর্শনের ধারাটি যেমন গ্রীক পরমাণুবাদে সংহত হয়েছিল, এখানে এমনটি হতে পারে নি।

গ্রীক পরমাণুবাদী ধারাটির একরৈখিক বিকাশ লক্ষ্য করি; লেউকিপ্পস দেমোক্রিতস এপিকুরস লুক্রেৎসিউস। ভারতীয় পরমাণুবাদ ত্রিধারায় বিকশিত; বৈশেষিক জৈন বৌদ্ধ। এটি পরমাণুবাদী ধারণা সমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য এনে ভারতীয় পরমাণুবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা ভারতীয় ও গ্রীক পরমাণুবাদের তুলনার সময়, ভারতীয় ও গ্রীক পরমাণুবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর উপরই নজর দেব।

গ্রীক পরমাণুবাদ সর্বব্যাপী; মন আত্মা দেবতা সবই পরমাণু গঠিত। সে দর্শনে পরমাণু ও শূন্যতা ছাড়া আর কোনো প্রাথমিক সত্তাকে স্বীকার করা হয় না। পক্ষান্তরে যে-সব ভারতীয় দার্শনিক ধারায় পরমাণু স্বীকৃত, সে-সব ধারায় শুধু পরমাণু এবং আকাশ (এটিই গ্রীক শূন্যতার তুল্য ধারণা) প্রাথমিক সত্তা নয়। সেখানে মন, আত্মা, কাল এরকম আরো প্রাথমিক সত্তা স্বীকৃত। ভারতীয় পরমাণুবাদে মন ও আত্মা পরমাণু গঠিত নয়। ভারতীয় পরমাণুবাদে অবশ্য দেবতা বা ঈশ্বর নেই। গ্রীক পরমাণুবাদে পরমাণুর গতি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শূন্যতা যতো গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে, ভারতীয় পরমাণুবাদে তেমনটি হয় নি। গ্রীক পরমাণুবাদে একটি সমসত্ত্ব নিরবধি 'কাল' অঘোষিতভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় পরমাণুবাদে আমরা 'আকাশ' ও 'কাল' সম্বন্ধে তিন ধরনের ধারণা পাচ্ছি। পরমাণু মুহূর্তেই ধ্বংস ও সৃষ্টি হয়ে একটি পরম্পরা তৈরী করে, বৌদ্ধ ধারার পরমাণুবাদের এ ধারণাটি দুই ধারার পরমাণুবাদের মধ্যেই অভিনব। পরমাণুর গতিপথ থেকে আকস্মিকভাবে বেঁকে যাওয়া, যা ঘটনা ধারায় আকস্মিকতা নিয়ে আসে, এমন ধারণা ভারতীয় পরমাণুবাদে অনুপস্থিত। গ্রীক পরমাণুবাদ পরমাণুর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে আকার আকৃতি ও ওজন এ তিনটি গুণকে চিহ্নিত করেছে। গন্ধ স্বাদ বর্ণ স্পর্শ এসব পরমাণুর প্রাথমিক গুণ নয়। দেমোক্রিতস এর মতে এসব গুণগুলো পরমাণুতে আরোপিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের গুণ। সে হিসাবে এসব বস্তুগত (objective) নয়, বক্তাগত (subjective)। এপিকুরস বলেন, পরমাণু মিলিত হয়ে কোন যৌগ গঠন করলে, সেই যৌগে এসব গুণ উদ্ভূত হয়। তাই এসব গুণ বক্তাগত নয়, বস্তুগত। ভারতীয় পরমাণুবাদ গন্ধ স্বাদ বর্ণ স্পর্শ এ গুণগুলোকেও পরমাণুর প্রাথমিক গুণ বলে গণ্য করেছে। ভারতীয় পরমাণুবাদে পরমাণুর গুণগুলোকে সাধারণ গুণ ও বিশেষ গুণ এ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। পরমাণুদের সংযুক্তির নিয়ম নিয়ে ভারতীয় পরমাণুবাদ যত ভাবিত, গ্রীক পরমাণুবাদ তেমনটা নয়। কারণ ভারতীয় পরমাণুবাদ আয়ুর্বেদ ও রসায়ন শাস্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি যুগিয়েছিল। বিপরীতে গ্রীক পরমাণুবাদ একটি বিশ্বদৃষ্টির ভিত যুগিয়েছে, কোন বিশেষ বিজ্ঞানের ভিত্তি হয় নি।

আধুনিক পরমাণুবাদের সূচনা দেমোক্রিতস-এর পরমাণুবাদ থেকে, এপিকুরীয় পরমাণুবাদ থেকে নয়। মহাবিশ্ব পরমাণু ও শূন্যস্থান পূর্ণ। শুধুমাত্র আকার আকৃতি ও ওজন বিশিষ্ট পরমাণুরা শূন্যস্থানে চলমান। এখানে পরমাণুরা আকস্মিকভাবে গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয় না। বাহুল্যবর্জিত এই তত্ত্বকাঠামোটি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে আত্মীকরণ সহজ ছিল। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানও দেমোক্রিতস-এর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (secondary) গুণ ধারণাটি গ্রহণ করেছে। এর প্রভাবেই গ্যালিলিও পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা সূচীতে আয়তন আকার ওজন গতি, একটি স্কেলে পরিমাপ যোগ্য এসব 'বস্তুগত' বিষয়কে রেখে, গন্ধ স্বাদ বর্ণ স্পর্শ এসব 'ব্যক্তিগত' বিষয়কে বাদ দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞানে এপিকুরীয় আকস্মিকতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং 'বস্তুগত' ও 'ব্যক্তিগত' ধারণাগুলোর মধ্যে জলঅচল ব্যবধান মিটিয়ে এনেছে। কিন্তু এখনও বিজ্ঞানে 'বস্তুগত-ব্যক্তিগত' বিভাজনের ভূতের রাজত্ব বহাল রয়েছে।

এপিকুরস পরমাণুর 'তাত্ত্বিক বিভাজ্যতা'র কথাও বলেছিলেন। আমরা দেখেছি সাংখ্য যদিও পরমাণুবাদী নয়, সাংখ্যের মধ্যযুগীয় ভাষ্যকাররা পঞ্চভূতের মূল উপাদান হিসাবে পরমাণুকে গ্রহণ করেছেন। একটি আদি অবয়বহীন অবস্থা থেকে ক্রমে পঞ্চতন্মাত্রা হয়ে পঞ্চমহাভূতের পরমাণু কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে এর বর্ণনা তারা দিয়েছেন। এই বিবর্তনবাদী ধারণাটি থেকে ভারতীয় পরমাণুবাদ সমৃদ্ধ হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি। বরং মধ্যযুগের ভাষ্যকাররা পরমাণুবাদে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেন ভারতীয় পরমাণুবাদ তার অন্তর্নিহিত দূর্বলতার জন্যই আধুনিক পরমাণুবাদের জন্ম দিতে পারে নি। আমরা তা মনে হয় না। এ কথা সত্য, বাহুল্যবর্জিত দেমোক্রেতীয় পরমাণুবাদকে যত সহজে আধুনিক পরমাণুবাদে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে, বাহুল্যভরা ভারতীয় পরমাণুবাদকে এত সহজে আধুনিক পরমাণুবাদে রূপান্তরিত করা যেত না। কিন্তু ভারতীয় পরমাণুবাদের বিচিত্র ধারণাগুলো থেকে আধুনিক পরমাণুবাদ সমৃদ্ধ হতে পারত। গ্রীক পরমাণুবাদ থেকে যে

আধুনিক পরমাণুবাদ বিকশিত হতে পেরেছে এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল, ইউরোপে বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশ। ভারতে তেমন আর্থসামাজিক শক্তির এবং সামাজিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে নি, যা ভারতীয় পরমাণুবাদকে আধুনিক পরমাণুবাদে রূপান্তরিত করবে।

যেহেতু ভারতীয় পরমাণুবাদী সাহিত্য থেকে প্রাচীনতর গ্রীক পরমাণুবাদী সাহিত্য পাওয়া যায় এবং গ্রীস ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, তাই এ সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, ভারতীয় পরমাণুবাদ গ্রীক পরমাণুবাদের অনুসারী। কিন্তু দু'ধরনের পরমাণুবাদের পার্থক্য এবং ভারতীয় পরমাণুবাদের বৈচিত্র্য এ 'আমদানি তত্ত্ব' দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বরং স্থানীয় উৎস থেকেই ভারতীয় পরমাণুবাদ বিকশিত হয়েছে, এমন মনে করাটা অধিক যুক্তিযুক্ত। আর এরকম দার্শনিক পটভূমি যে ভারতে ছিল, তা আমরা আগেই দেখিয়েছি।

এপিকুরীয় দর্শন ও চার্বাক দর্শন

এ তুলনামূলক আলোচনায় আমাদের মনে রাখতে হবে, এপিকুরস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তার নিজের লেখা ও শিষ্যদের লেখা থেকে সরাসরি প্রাপ্ত। সামান্য বিষয় তার সমালোচকদের লেখা থেকে নেয়া। পক্ষান্তরে চার্বাকদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পুরোপুরি তাদের সমালোচকদের লেখার উপর নির্ভরশীল।

এপিকুরস আদ্যন্ত বস্তুবাদী। এপিকুরসে শুধু বস্তুগুলি নয়, মন আত্মা দেবতা সবই পরমাণু গঠিত। এপিকুরস দেবতাদেরকে পরমাণু গঠিত বলে তাদেরকে মর মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। আবার ব্যাজস্তুতি করে বলেছেন, দেবতারা এপিকুরীয় সুখবাদী নীতি অবলম্বন করে নিজেদের জগতে সুখে দিন যাপন করেন। পৃথিবীতে হস্তক্ষেপের ঝামেলা পোহানোর মতো বোকা তারা নন। এভাবে তিনি মানুষের জীবনকে দেবতাদের আওতার বাইরে নিয়ে এসেছেন। প্রশ্ন আসতে পারে এমন দেবতার দরকার কী ? আমার মনে হয় এটি একটি কৌশল। ধর্মব্যবসায়ীরা যাতে তাকে নাস্তিক আখ্যা দিয়ে দেবতা বিশ্বাসী সাধারণ মানুষকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে না পারে, এজন্যই তিনি এ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তবে এপিকুরীয়গণ সবসময় কু-সংস্কার ও বুজরুকির বিরোধিতা করতেন, এজন্য কায়েমী স্বার্থের চক্ষুশূল ছিলেন।

চার্বাকও আদ্যন্ত বস্তুবাদী এবং এপিকুরসের চেয়েও কঠোর বস্তুবাদী। চার্বাকরা এপিকুরসের মতো কৌশল অবলম্বন করেন নি, সরাসরি দেবতা ঈশ্বর পরলোক শাস্ত্র সবকিছুকে অস্বীকার করেছেন। কৌশলে কাজ হতো কি ? রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্মের উত্থানের আগ পর্যন্ত এপিকুরীয় কৌশল কাজে লেগেছিল। কিন্তু খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মব্যবসায়ীরা তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছে। এপিকুরীয় সম্প্রদায়কে তাদের শাস্ত্রসহ উচ্ছন্ন করে ছেড়েছে। শুধু 'এপিকুরীয়ানিজম' শব্দটি রেখে দিয়েছে একটি নিকৃষ্ট গালি হিসাবে। ভারতে চার্বাকরা আপোস করেন নি। ফলাফল এপিকুরীয়দের মতোই। ধর্মধ্বজীরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন চার্বাক মানেই নাস্তিক, চার্বাক মানেই ঋণ করে ঘি খাওয়া শিশ্নোদর পরায়ণ প্রাণি। সাংখ্য, বৈশেষিক-এ ঈশ্বর নেই। তারা বেদের স্বীকৃতি দিয়ে ধর্মধ্বজীদের সঙ্গে আপোস করতে চেয়েছেন। তাই তাদের কপালে নাস্তিক আখ্যা জোটেনি। কিন্তু তারা তাদের স্বকীয়তাও বজায় রাখতে পারেনি। সাংখ্যের 'প্রকৃতি' এবং বৈশেষিক এর 'অদৃষ্ট', রূপান্তরিত হয়েছে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'য়।

এপিকুরস যেমন মন এবং আত্মার জন্য ভিন্নরকম পরমাণুর কল্পনা করেছেন, চার্বাকরা তা করেন নি। তারা বলেছেন মন ও আত্মা চার ভূতে গঠিত দেহেরই বিশেষ উদ্ভূত গুণ। এসব বিবেচনায় চার্বাকদের বস্তুবাদ এপিকুরীয় বস্তুবাদের থেকেও উত্তম। কিন্তু এপিকুরীয় বস্তুবাদ যেমন পরিশীলিত পরমাণুবাদে রূপ নিয়েছিল, চার্বাকরা তা করতে পারেননি বা করার সুযোগ পাননি।

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এপিকুরস সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিন প্রত্যক্ষকে তারপর যুক্তিকে। চার্বাকরা প্রমাণ হিসাবে প্রত্যক্ষ এবং লোকসিদ্ধ অনুমান (প্রত্যক্ষ নির্ভর অনুমান) শুধু দুটোকেই মানেন। স্মরণীয় চার্বাকরাই প্রথম দুধরনের অনুমানের কথা বলেছেন: লোকসিদ্ধ বা উৎপন্ন প্রতীতি আর শাস্ত্রসিদ্ধ বা উৎপাদ্য প্রতীতি। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অনুমানের এ দুটি বিভাগ, তাদের অন্যতম কৃতিত্বের নিদর্শন। তবে এপিকুরস জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াটির যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, চার্বাকদের এমন রচনার সন্ধান মেলে নি। এপিকুরস সুখবাদী, স্থূল দৈহিক ভোগবাদী নন। তার মতে অসুখের অনুপস্থিতিই সুখ। পরিমিত জীবন যাপনই তার আদর্শ। চার্বাকরাও সুখবাদী। বৈরাগ্যের ভারতীয় ঐকতান, যাতে হিন্দু জৈন বৌদ্ধ তাদের দর্শন নিয়ে শামিল, এর একমাত্র ভিন্নস্বর চার্বাক। সব প্রতিপক্ষ মিলে তাদেরকে পশুর মত দেহস্বর্বস্ব ভোগবাদী এসব যত গালিই দিক না কেন, আদতে তারা মোটেই তেমন নন। তাদের প্রতি বর্ষিত খিস্তিখেউড় ছাড়া তাদের নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে অন্যকোনো কথা বিরোধীদের লেখায় পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে তাদের মতবাদটি পুণর্গঠিত করলে যা দাঁড়ায় তাতে মনে হয়, এ ব্যাপারে তারা ছিলেন বাস্তববাদী। দুনিয়াতে সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে। দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে সম্ভাব্য সুখকে ত্যাগ করার কোন মানে হয় না। সুখ-দুঃখ তো এ জীবনেই ভোগ করতে হবে, পরকাল বলে তো কিছু নেই।

ভারতীয় বস্তুবাদ ও পরমাণুবাদের পরিণতি

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে চরম বস্তুবাদী চার্বাকদের স্বর আর শোনা যায় না। কিন্তু তাদের প্রভাব রয়ে যায় আমাদের সংস্কৃতির গভীরে। আমরা পরবর্তী সংখ্যায় তা আলোচনা করব। ক্রমে বৌদ্ধ দার্শনিকদের স্বরও থেমে যায়। তাদের দর্শনের বেশীর ভাগ বিষয়ই অন্যান্য দর্শন আত্মীকৃত করে নেয়। এ-সময়ে স্বতন্ত্রভাবে বাস্তববাদী সাংখ্য-যোগ-এর চর্চাও স্থিমিত হয়ে পড়ে। আদিম তন্ত্র থেকেই সাংখ্য-যোগ-এর বিকাশ ঘটেছিল। পরিবর্তিত তন্ত্রের মূলেও সাংখ্যেও প্রকৃতি প্রধান্য বহাল থাকে। বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ধারাগুলি সাংখ্য-যোগকে গ্রহণ করে নিজেদের মতো করে। এতে সাংখ্যের বাস্তববাদ বহাল রইল বটে; প্রকৃতি প্রাধান্য বহাল রইল না। অদ্বৈত বেদান্ত তার চরম ভাববাদী রূপটি বহাল রাখে। কিন্তু বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত ও দ্বৈত ধারা বাস্তববাদকে স্থান করে দেয়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদীরা বাস্তবতার বর্ণনায় সাংখ্য দর্শনকে কাজে লাগাল, আর দ্বৈতবাদীরা কাজে লাগাল বৈশেষিক দর্শনকে। মীমাংসা দর্শন এবং জৈন দর্শন পরমাণুবাদ সমেত তাদের অবস্থান বজায় রাখে। ন্যায়-বৈষেশিক নব্যন্যায়ে রূপান্তরিত হয়ে (যুক্তি) তর্ককেই তাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করে। কিন্তু 'পদার্থ' চর্চা একেবারে থেমে যায়নি। পূর্ববর্তী বৈশেষিক গ্রন্থগুলির টীকা রচনার কাজ চলতে থাকে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি (১৪৬০-১৫৪০ খ্রি) 'পদার্থখণ্ডন' গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনে আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। তার টীকাকাররা ধারাটিকে অব্যাহত রাখেন। নব্যন্যায়ের শেষ গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক গদাধর ভট্টাচার্য্যচক্রবর্তী (১৬০৪-১৭০৯ খ্রি)। লোকশ্রুতি রয়েছে, মৃত্যুশয্যায় যখন পরিজনেরা তাকে ইষ্টনাম জপ করতে বললেন, তিনি উচ্চারণ করলেন 'পিলু পিলু'। পিলু মানে পরমাণু। উপনেবিশত হওয়ার সময় পর্যন্ত, এদেশে ক্ষীণ হলেও পরমাণুবাদী ধারা যে বহমান ছিল, এটি এর নজির।

বিরঞ্জন রায়: মনোরোগ চিকিৎসক ও লেখক
ইমেইল: bidhanranjan@gmail.com

পরবর্তী সংখ্যায়: ভারতীয় বস্তুবাদের উত্তরাধিকার। (তথ্যসূত্র একসঙ্গে দেয়া হবে)